৯.১ সামাজিক স্তরবিন্যাসের অর্থ (Meaning of Social Stratification)

পৃথকীকরণ প্রকৃতির নিয়ম। মানবসমাজে এই পৃথকীকরণ পরিলক্ষিত হয়। কোন দুটি মানুষ একেবারে সমরূপ নয়। বিভিন্নতা ও অসাম্য সমাজের অন্তর্নিহিত বিষয়। স্বভাবতই সর্বত্র মানবসমাজ স্তরবিন্যস্ত। বিভিন্ন বিষয়ে ব্যক্তিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শারীরিক গঠন সকলের এক রকম হলেও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য দেখা যায়। ব্যক্তিবর্গের বহিরঙ্গের গঠন, বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিকতা, মানসিক গঠন, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, আর্থ-রাজনীতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পার্থক্য বর্তমান। সকল সমাজেই সদস্যদের প্রবীণতা, নবীনতা ও সাম্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিন্যস্ত করা হয়। ঊর্ধ্বাধঃভাবে সমাজের সদস্যদের ক্রমোচ্চ বিন্যাসই স্তরবিন্যাস হিসাবে পরিচিত।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা || সমাজব্যবস্থায় স্তরবিন্যাসের ধারণাটি নেওয়া হয়েছে ভূ-বিদ্যা থেকে। সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে ক্রমোচ্চ স্তরভেদে বিন্যস্ত করার জন্য ভূ-বিদ্যার এই ধারণাটির সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে উচ্চ-নীচ পর্যায়ে-বিভক্ত করাকেই বলে সামাজিক স্তরবিন্যাস। কোন সমাজের সকল সদস্য কোনভাবেই অভিন্ন স্তর বা পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। মানবসমাজ সহজাতভাবেই বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। অর্থাৎ যে-কোন সমাজের সকল অধিবাসীই বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। একেই বলে সামাজিক স্তরবিন্যাস। সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন স্তরে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করলে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে ক্ষমতা ও মর্যাদার এক সোপান। একেই বলে স্তরবিন্যাস।

অধ্যাপক সরোকিন ও পারসনস-এর অভিমত || সরোকিন এর অভিমত অনুসারে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে জনগণের পর্যায়ক্রমে বিভক্ত করাকে বোঝায়। সামাজিক স্তরবিন্যাসের একদিকে থাকে উচ্চশ্রেণী এবং অপরদিকে থাকে নিম্নশ্রেণী। সরোকিনের মতানুসারে এই স্তরবিন্যাসই হল সুসংগঠিত সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। ট্যালকট পারসনস এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সামাজিক দিক থেকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ঊর্ধ্বতন-অধস্তন বা উচ্চ-নীচ বিবেচনার ভিত্তিতে প্রভেদমূলক পদবিন্যাস সৃষ্টি করলে তাকে বলে স্তরবিন্যাস। সামাজিক ক্ষেত্রে অসাম্যের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হল এই স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বংশানুক্রমে বিশেষাধিকারসমূহ কায়েম থাকে। এই স্তরবিন্যাস হল ঐতিহ্যের দ্বারা আরোপিত একটি ব্যবস্থা। সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত অধিকাংশ মানুষের সচেতন ধারণা বা সম্মতি ছাড়াই এই ব্যবস্থা বর্তমান থাকে।

বটোমোর ও জিসবার্টের অভিমত || বটোমোরের অভিমত অনুসারে সকল সমাজ-কাঠামোতেই বিভিন্ন স্তরে ও শ্রেণীতে সমাজের বিভাজন এবং তার ভিত্তিতে ক্ষমতা ও মর্যাদার ক্রমোচ্চ বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। একেই বলে সামাজিক স্তরবিন্যাস। বটোমোর বলেছেন: "(Social stratification is) the division of society into classes of strata, which

form a hierarchy of prestige and power....'' জিসবার্ট-এর মতানুসারে প্রাধান্য ও বশ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত স্থায়ী গোষ্ঠী বা শ্রেণীতে সমাজের যে স্তরবিভাগ তাকেই বলে সামাজিক স্তরবিন্যাস।

টিউমিনের অভিমত ‖ মেলভিন টিউমিন এর মতানুসারে সামাজিক স্তরবিন্যাস হল মানবিক সম্পর্কের স্তরবিন্যাস। সামাজিক স্তরবিন্যাসের কোন জৈব তাৎপর্য নেই। সমাজতত্ত্ববিদ্দের আগ্রহ থাকে মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য বা জৈব গুণাবলীর ব্যাপারে সামাজিক তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে।

তাঁর মতে স্তরবিন্যাস সকল যুগের সকল সমাজব্যবস্থাতেই বর্তমান ছিল। তবে কালের প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে স্তরবিন্যাসের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। জৈব বা প্রকৃতিগত কারণে স্তরবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের সঙ্গে সামাজিকীকরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। স্তববিন্যাসের কার্যকারিতা সামাজিকীকরণের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। মানবসমাজের বহু ও বিভিন্ন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবস্থা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উপর সামাজিক স্তরবিন্যাস নির্ভরশীল। তেমনি আবার বিপরীতক্রমে সামাজিক স্তরবিন্যাস সমাজজীবনের এই সমস্ত বিধিব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণও করে থাকে। মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে সংযুক্ত সুযোগ-সুবিধা অথবা ব্যবস্থাদির ব্যাপারেও সামাজিক স্তরবিন্যাসের কার্যকরী প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

সামাজিক স্তরবিন্যাস-এর সামাজিক ভূমিকা ও মর্যাদা ‖ সামাজিক ভূমিকা বা বৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে সকল সামাজিক গোষ্ঠী তার সদস্যদের স্বতন্ত্র করে থাকে। যে সমস্ত ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তিধারী বা ভূমিকার অধিকারী তারা সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এবং তারা সামাজিক মর্যাদা লাভ করে থাকে। মানবসমাজের কিছু কিছু কাজকর্ম অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন প্রকৃতির বলে প্রতিপন্ন হয়। সেই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় অপেক্ষাকৃত অধিক মেধা, বিচক্ষণতা, সামর্থ্য ও প্রশিক্ষণের। অনেকের অভিমত অনুসারে এই সমস্ত গুণান্বিত মানুষকে ওই সমস্ত কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য আকর্ষণ করার প্রক্রিয়ায় সমাজে সৃষ্টি হয় স্তরবিন্যাসের। সামাজিক স্তরগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক মর্যাদা ও ভূমিকা ভিন্ন হয়। সমাজের উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সামাজিক ভূমিকা ও মর্যাদা নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সামাজিক ভূমিকা ও মর্যাদার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষ উচ্চ মর্যাদা লাভ করে এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষ নিম্ন মর্যাদা লাভ করে। বস্তুত মর্যাদাবোধই একটি সামাজিক স্তরকে অপরাপর সামাজিক স্তর থেকে স্বতন্ত্র করে। তাছাড়া উৎকর্ষ-অপকর্ষের ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিভাগ নির্দেশ করা হয়। এবং এই স্তরভেদ মোটামুটি স্থায়ী।

ম্যাকাইভার ও পেজের অভিমত ‖ একদিক থেকে বিচার করলে সামাজিক স্তরবিন্যাস খাড়া করা একটি সিঁড়ির মত প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ সামাজিক স্তরবিন্যাস হল একটি সামাজিক সিঁড়ি। এই সিঁড়ির যে যত উচ্চ ধাপে অবস্থিত, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও মান-মর্যাদা তাঁর তত বেশি। সুতরাং সামাজিক স্তরবিন্যাসের সঙ্গে সামাজিক ভূমিকা ও সামাজিক মর্যাদা ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই কারণে ম্যাকাইভার ও পেজ এর অভিমত অনুসারে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে মর্যাদানুসারী স্তরবিভাগকে বোঝায়। এই মর্যাদাবোধের ভিত্তি হল আর্থ-রাজনীতিক অথবা পুরোহিততান্ত্রিক ক্ষমতা। এই মর্যাদাবোধের ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণীসমূহের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। এবং এই মর্যাদাবোধ সমগ্র সমাজকে শ্রেণী অনুসারে সংগঠিত করে। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের জীবনযাত্রার প্রণালী ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ এই মর্যাদাবোধ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়।

আরোপিত ও অর্জিত স্তরভেদ ‖ মানবসমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে অসাম্য বা স্তরভেদ পরিলক্ষিত হয় তা মূলত দু'ধরনের: বংশগত বা আরোপিত এবং অর্জিত।

সমাজে জন্মগত কারণে বা বংশগত কারণে মানুষে-মানুষে অসাম্য বা পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। আবার এই অসাম্য বা পার্থক্য সমাজের দ্বারা আরোপিতও হতে পারে। তেমনি আবার ব্যক্তির নিজস্ব উদ্যোগে অর্জিত গুণগত যোগ্যতার ভিত্তিতেও সামাজিক স্তরভেদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পার্থক্য বা ব্যক্তিগত অসাম্য যেমন জন্মগত হতে পারে, তেমনি আবার অর্জিতও হতে পারে। কিন্তু বৈষম্য হল সমাজের সৃষ্টি। সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতার বিন্যাস, পদমর্যাদা বা সুনাম, পরিবেশ প্রভৃতির ভিত্তিতেও অসাম্য বা স্তরভেদ দেখা দেয়।

৯.২ সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (Different Characteristics of Social Stratification)

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

(১) **উদ্ভবগত বৈশিষ্ট্য** ‖ সাধারণত সম্পত্তি, ক্ষমতা ও মর্যাদার পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের উদ্ভব হয়।

(২) **মর্যাদাভিত্তিক উর্ধ্বাধ বিন্যাস** ‖ অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ এর মতানুসারে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে মর্যাদাভিত্তিক গোষ্ঠীসমূহের উর্ধ্বাধ বিন্যাসকে বোঝায়। সামাজিক ভূমিকা ও সামাজিক মর্যাদা সামাজিক স্তরবিন্যাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। উল্লম্বী স্তরবিন্যাসের উদাহরণ হিসাবে হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি উচ্চ-নীচ জাতিভেদ ব্যবস্থার কথা বলা হয়।

(৩) **সামাজিক মান ও রীতির নিয়ামক** ‖ সামাজিক স্তরবিন্যাস হল সামাজিক মান ও রীতির নিয়ামক। সামাজিক স্তরবিন্যাসের মাধ্যমে সামাজিক মান ও রীতি পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। বস্তুত সামাজিক স্তরবিন্যাস হল মানবিক সম্পর্কের স্তরবিন্যাস।

(৪) **জীবনধারণের প্রণালীকে প্রভাবিত করে** ‖ সামাজিক স্তরবিন্যাস সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের জীবনধারণের প্রণালীকে প্রভাবিত করে। সামাজিক রীতি-নীতি, বিধি-ব্যবস্থা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির প্রকৃতি সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। আবার সামাজিক স্তরবিন্যাসও এই সমস্ত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

(৫) **সামাজিকীকরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত** ‖ সামাজিক স্তরবিন্যাস সামাজিকীকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। সামাজিকীকরণের কার্যকারিতার উপর সামাজিক স্তরবিন্যাসের স্থায়ীত্ব নির্ভরশীল। সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া উত্তর-পুরুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

(৬) **সামাজিক মিথষ্ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে** ‖ সামাজিক স্তরবিন্যাসের দ্বারা সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া (social interaction) নিয়ন্ত্রিত হয়। কিছু বিশেষ ধরনের মিথষ্ক্রিয়া সংগঠিত হয় কেবলমাত্র অভিন্ন স্তরভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে। এই রকম মিথষ্ক্রিয়া বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে সংঘটিত হয় না। এ ধরনের মিথষ্ক্রিয়ার উদাহরণ হিসাবে বৃত্তি নির্বাচন, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, বন্ধুত্ব স্থাপন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত মিথষ্ক্রিয়া সাধারণত সম-স্তরভুক্ত ও সমমর্যাদার ব্যক্তিদের মধ্যেই সংগঠিত হয়ে থাকে। বস্তুত এই সমস্ত মিথষ্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক স্তরবিন্যাসের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা অধিকতর কঠোর ও কার্যকরী। আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে মিথষ্ক্রিয়ার ব্যাপারে সামাজিক স্তরবিন্যাসের তেমন কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে সভা-সমিতি, খেলার মাঠ, যানবাহন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৭) **সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার সম্পর্ক** ‖ মানবসমাজের বিভিন্ন স্তরে বা পর্যায়ে বিন্যস্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সহযোগিতা ও সহাবস্থানের সম্পর্ক যেমন থাকে, তেমনি প্রতিযোগিতা

ও দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কও থাকে। হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রথমোক্ত ধরনের সম্পর্কের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে বিভিন্ন আর্থনীতিক ও মর্যাদাভিত্তিক শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের অস্তিত্বও দেখা যায়।

(৮) স্তরবিন্যাসের প্রকৃতির ক্ষেত্রে পার্থক্য || সকল সমাজের স্তরবিন্যাসের প্রকৃতি এক রকমের নয়। তেমনি আবার বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গের প্রতি প্রদত্ত মর্যাদাও সকল সমাজে অভিন্ন রকমের হয় না। সকল সমাজেই বিভিন্ন স্তরের মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু এর পিছনে কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি সব সময় থাকে না। মান-মর্যাদার ক্ষেত্রে তারতম্য সৃষ্টির ব্যাপারে বহু বিচিত্র কারণ বর্তমান থাকে। এই সমস্ত কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ধর্মীয় কারণ, প্রাচীন বা বিস্মৃত অতীতের কোন ধারণা, কুসংস্কার, অযৌক্তিক বা গুপ্ত কোন বিশ্বাস প্রভৃতি।

(৯) আরোপিত ও অর্জিত স্তরভেদ || সাধারণত দু'ধরনের সামাজিক স্তরভেদ পরিলক্ষিত হয় : (১) বংশগত বা আরোপিত (ascribed) এবং অর্জিত (achieved)। সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বংশগত বা জন্মগত কারণে অসাম্য-বৈষম্যের সৃষ্টি হতে পারে এবং হয়। আবার সমাজের দ্বারা এই অসাম্য অরোপিতও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার কথা বলা যেতে পারে। হিন্দু সমাজে জন্মগতভাবে যে ব্যক্তি যেখানে অবস্থিত, তাকে আজীবন সেই অবস্থান স্বীকার করে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। আবার বিপরীতক্রমে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অর্জিত গুণগত যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ক্ষেত্রে স্তরভেদের সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিকে সমাজে উচ্চমর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা হয়। এইভাবে যে কোন ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য জ্ঞান আহরণের ভিত্তিতে সমাজে উচ্চ-মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বা সম্পদ সামগ্রীর পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ব্যাপারে এ রকম উদাহরণের অভাব নেই। এ ধরনের সামাজিক মর্যাদা হল অর্জিত, একে পুরুষানুক্রমিক বলা যায় না।

(১০) সার্বজনীন ও চিরন্তন || সকল সমাজেই স্তরবিন্যাস অল্প-বিস্তর বর্তমান দেখা যায়। অর্থাৎ সামাজিক স্তরবিন্যাস হল চিরন্তন ও সার্বজনীন।

টিউমিন সামাজিক স্তরবিন্যাসের স্বীকৃত বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণের কথা বলেছেন। এগুলি সংখ্যায় পাঁচটি। (এক) স্তরবিন্যাস প্রাচীন (দুই) স্তরবিন্যাস বিশ্বজনীন (তিন) স্তরবিন্যাস সামাজিক (চার) স্তরবিন্যাস অনবর্তী মূলক (consequential) এবং (পাঁচ) স্তরবিন্যাস বিভিন্ন ধরনের।

৯.৩ সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন ধরণ (Types of Social Stratification)

সামাজিক স্তরবিন্যাস হল সর্বজনীন ও চিরন্তন। সর্বকালে এবং সকল সমাজব্যবস্থায় স্তরবিন্যাস বর্তমান ছিল ও আছে। তবে কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক স্তরবিন্যাসের আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। এর রূপ ও প্রকৃতি কালের প্রবাহে পরিবর্তিত হয়েছে। যুগে যুগে সামাজিক স্তরবিন্যাসের চেহারা-চরিত্রের রূপান্তর ঘটেছে। তার ফলশ্রুতি হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ। আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ সামাজিক স্তরবিন্যাসকে সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত করে থাকেন। সামাজিক স্তরবিন্যাসের এই তিনটি ভাগ হল: (১) সামন্ত বা ভূমিস্বত্ব প্রথা (Estates), (২) শ্রেণীবিভাগ (Class System) এবং (৩) জাতিভেদ প্রথা (Caste System)। সামাজিক স্তরবিন্যাসের এই তিনটি ধরন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা আবশ্যক।

৯.৩.১ সামন্ত বা ভূমিস্বত্ব প্রথা (Estates)

'ভূমিস্বত্ব' (estate) ব্যবস্থা এক ধরনের স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা। মধ্যযুগের ইউরোপে এ ধরনের স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা বর্তমান ছিল। ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। বলা হয় যে প্রাচীনকালে রোমান সাম্রাজ্যে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। আধুনিক কালে সে দিন পর্যন্ত ইউরোপে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল।

এস্টেটস প্রথা ‖ অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজবিজ্ঞানীরা 'estate' অর্থে 'শ্রেণী' শব্দটি ব্যবহার করতেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে এই ভূমিস্বত্ব প্রথা বা 'এস্টেটস প্রথা'র কথা বলা হয়। কতকগুলি উচ্চ-নীচ সামাজিক স্তরের সমষ্টি হল এই এস্টেটস ব্যবস্থা। এই সামাজিক স্তরগুলি পরস্পরের থেকে সুস্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য আইন ও প্রচলিত প্রথার দ্বারা সুনির্দিষ্ট। প্রতিটি পর্যায় বা স্তরের দায়-দায়িত্ব কঠোরভাবে সুনির্দিষ্ট। এস্টেটস ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি স্তরের সামাজিক অবস্থান সাধারণত উত্তরাধিকারমূলক। তবে ক্ষেত্রবিশেষে আইনানুসারে অবস্থানের পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থায় এবং সামন্ততন্ত্রের রুদ্ধ আর্থনীতিক ব্যবস্থায় এস্টেটস প্রথা ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি অনড় ব্যবস্থা। আগেকার ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সামন্ততান্ত্রিক এস্টেটস প্রথার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়।

ভূমিস্বত্বকেই ইংরেজিতে বলা হয় 'Estates'। এই ইংরেজি শব্দটির অর্থ জমিদারের মালিকানাধীন জমি। মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বর্তমান ছিল। এই ধরনের সমাজব্যবস্থায় 'এস্টেটস' অর্থে জমিদারি বোঝাত। পরবর্তী কালে এক ধরনের স্তরব্যবস্থা বোঝাতে 'এস্টেট' শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। তখন স্তরব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি পর্যায়, স্তর বা গোষ্ঠীকে বলা হয় 'এস্টেটস'। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে যাজক সম্প্রদায় (Clergy or First Estate), অভিজাত সম্প্রদায় (Nobility or Second Estate) এবং জনসাধারণ (Commonalty)-এর কথা বলা যায়।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ‖ মধ্যযুগে বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ভূমিস্বত্ব প্রথাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের স্তরবিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। এই সময় সকল ভূমির চূড়ান্ত পর্যায়ের মালিক ছিলেন রাজা বা নৃপতি। এবং জমিদার ও প্রজারা কেবলমাত্র ভূমির স্বত্ব উপভোগকারী হিসাবে বিবেচিত হতেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল: আইনের মাধ্যমে এস্টেটস স্থিরীকৃত হত। প্রত্যেক এস্টেটের সামাজিক মর্যাদা ছিল সুনির্দিষ্ট। আইনের দ্বারা নির্ধারিত অধিকার ও কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হত।

সামন্ততান্ত্রিক ইংল্যান্ডে তিন ধরনের ভূমিস্বত্ব ‖ মধ্যযুগের ইংল্যান্ডে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বর্তমান ছিল। সামন্ততান্ত্রিক ইংল্যান্ডে তিন ধরনের ভূমিস্বত্ব প্রথা প্রবর্তিত ছিল: (ক) উত্তরাধিকারমূলক ভূমিস্বত্ব বা 'fee-simple' (খ) বংশধর-অনুসারী ভূমিস্বত্ব বা 'fee-tail' এবং (গ) 'জীবনস্বত্ব'। (ক) প্রথম ধরনের ভূমিস্বত্বের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে ভূমিস্বত্ব ন্যস্ত হত। উত্তরাধিকার না থাকলে ভূমিস্বত্ব গ্রহণ করতেন 'লর্ড' বা রাজাই। তবে ভূমির স্বত্বাধিকারী উইল করতে পারতেন। এ রকম উইল থাকলে ভূমিস্বত্ব বর্তাত উইল অনুসারে। ভূমিস্বত্বের এই প্রথা 'fee-simple'-নামে পরিচিত। (খ) দ্বিতীয় প্রকার ভূমিস্বত্বকে বলা হত 'fee-tail'। এ ধরনের ভূমিস্বত্বের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারীর অবর্তমানে ভূমিস্বত্ব বর্তাত বংশধরদের হাতে। ভূমির স্বত্বাধিকারীর কোন বংশধর না থাকলে ভূমিস্বত্ব ফিরে যেত মূল হস্তান্তরকারীর কাছে। এ রকম ভূমিস্বত্বের ক্ষেত্রে কোন রকম উইলের স্থান ছিল না। (গ) তৃতীয় প্রকার ভূমিস্বত্বকে বলা হত 'জীবনস্বত্ব'।

যাজক সম্প্রদায়, অভিজাত সম্প্রদায় এবং জনসাধারণ ‖ ইংল্যান্ডের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার প্রথমভাগে দেশের অধিবাসীরা বিভক্ত ছিল তিন অংশে (Three Estates)। অর্থাৎ অধিবাসীদের এই অংশগুলোকে বলা হত 'Estate'। সমকালীন ইংল্যান্ডের এই তিনটি 'Estate' হল: 'First Estate', 'Second Estate' এবং 'Third Estate'। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে 'যাজক সম্প্রদায়' (Clergy) 'First Estate'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'Second Estate'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল 'অভিজাত সম্প্রদায়' (Nobility) এবং 'Third Estate' বলতে বোঝাত জনসাধারণ-কে (Commonalty)। এই পর্যায়ের সর্বসাধারণের রাজনীতিক অধিকার ছিল অস্বীকৃত। তা ছাড়া আইনগত অধিকার ভোগের ক্ষেত্রেও বৈষম্য বর্তমান ছিল। যাই হোক পরবর্তী কালে এই 'তৃতীয় শ্রেণী'-কে নিয়ে গঠিত হয়েছে 'কমন্স সভা' (House of Commons)। এবং 'যাজক সম্প্রদায়' ও 'অভিজাত সম্প্রদায়'-কে নিয়ে গঠিত হয় 'লর্ডস সভা' (House of Lords)। 'লর্ডস সভা'র সদস্যদের মধ্যে এখনও শ্রেণীভিত্তিক বিভাজন পরিলক্ষিত হয়।

'ম্যানর প্রথা' ‖ ভূমিস্বত্ব প্রথা (Estates)-র একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল 'ম্যানর' (Manor) প্রথা। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান ছিল। এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উল্লেখ প্রসঙ্গে 'ম্যানর' প্রথার কথা বলা হয়। মধ্যযুগীয় ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ম্যানরগুলি ছিল বিশেষভাবে রাজনীতিক গুরুত্বসম্পন্ন। এই ম্যানরগুলি ছিল এক-একটি প্রশাসনিক এলাকা। এই প্রশাসনিক এলাকা গঠিত হত 'ভূস্বামী' বা 'লর্ড' এবং নির্ভরশীল প্রজাদের নিয়ে। ভূস্বামীদের প্রতি প্রজাদের বশ্যতা বর্তমান ছিল। এই বশ্যতা নিয়ন্ত্রিত হত প্রচলিত প্রথার দ্বারা এবং ভূস্বামীদের প্রতি প্রজাদের এই বশ্যতা সকল ক্ষেত্রে এক রকম ছিল না। ম্যানরের প্রজাদের সকলে সমপর্যায়ভুক্ত ছিল না। প্রজাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর পর্যায়ভুক্ত ছিল তাদের বলা হত 'স্বাধীন প্রজা' (Free man)। স্বাধীন প্রজাদের হাতে ছিল স্বীকৃত আইনগত অধিকার। তাদের এই আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা বিচারালয়ের সাহায্য লাভ করত। প্রজাদের মধ্যে যারা সর্বনিম্ন পর্যায়ভুক্ত ছিল তাদের বলা হত 'ভিলেন' (Villein)। এই ভিলেনদের অবস্থা ছিল অনেকাংশে ক্রীতদাসদের সামিল।

ফ্রান্সের 'ম্যানর' প্রথা ‖ বস্তুত 'ম্যানর' প্রথা হল একটি সামন্ততান্ত্রিক প্রথা। মধ্যযুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই সামন্ততান্ত্রিক প্রথা বিভিন্নভাবে প্রচলিত ছিল। ফ্রান্সে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান ছিল এবং সেখানেও 'ম্যানর' প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে ফ্রান্সে প্রচলিত ম্যানর প্রথার আকৃতি-প্রকৃতিতে কিছু পার্থক্য ছিল। তবে এখানেও ম্যানরের ভূস্বামী ও প্রজাদের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান ছিল, তা ছিল প্রকৃতিগত বিচারে মূলত শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক। ম্যানরের প্রজাসাধারণ শোষিত হত। এবং সামগ্রিক বিচারে তাদের অবস্থা ক্রীতদাসদের থেকে বিশেষ ভাল ছিল না।

ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ‖ প্রাচীনকালের ভারতবর্ষেও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। তবে ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল বহুলাংশে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। প্রাচীন ভারতে ভূমিস্বত্ব-ভিত্তিক জমিদার ও রায়ত এবং মধ্যবর্তী পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী রায়তের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। ভূমিস্বত্বের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থায় জমিদার ও প্রজার এক অত্যন্ত জটিল ও বিচিত্র স্তরবিন্যাস বর্তমান ছিল। জমিদার ও রায়তের মাঝখানে ছিল বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী রায়ত। এই সমস্ত রায়তীস্বত্বের সংখ্যা সব জায়গায় সমান ছিল না। বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থে এ রকম বহু ও বিভিন্ন স্তরের এবং নানা নামের মধ্যস্বত্বভোগী রায়তের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত এরা ছিল মধ্যস্বত্বভোগী উপ-জমিদার। স্বভাবতই এ রকম উপ-জমিদারের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা সঠিকভাবে বলা যায় না। জমিদারগণ জমি ইজারা বা পত্তন দিতেন এবং বিভিন্ন স্তরের বহু মধ্য উপস্বত্বভোগীর সৃষ্টি

করতেন। ভূস্বামী জমিদাররা নানা স্তরের অন্তর্ভুক্ত রায়তদের কাছে বিভিন্নভাবে নগদ টাকা আদায় করত এবং ভোগ করত বিভিন্ন রকম সেবামূলক কাজকর্ম। বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিস্বত্বে সীমিত মালিকানা বর্তমান ছিল। এই সীমিত মালিকানার ভিত্তিতে তারা অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্তী স্তর থেকে ভোগ করত কৃষিকার্যের লভ্যাংশের একটি অংশ। আবার অনেক সময় জমিদাররা প্রিয় রাজকর্মচারীকে পুরস্কৃত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের রায়তী স্বত্ব প্রদান করতেন। এই ব্যবস্থার ফলশ্রুতি হিসাবে সৃষ্টি হত বিভিন্ন রকমের অধিকার ও দায়-দায়িত্বের। এই সমস্ত কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে বঙ্গদেশের সমাজব্যবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল এক জটিল প্রকৃতির স্তরবিন্যাসের।

৯.৩.২ সামাজিক শ্রেণী (Social Class)

সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি বিশেষ ধরন হল 'সমাজিক শ্রেণী'। বিশেষত আধুনিক কালের সভ্য দেশসমূহে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের পর্যালোচনা পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক শ্রেণী ব্যবস্থা সর্বজনীন; বিশ্বব্যাপী বর্তমান। অনেক সময় বিভিন্ন পেশাগোষ্ঠীকে বোঝানোর জন্য 'শ্রেণী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ হিসাবে কৃষক শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী, শিক্ষক শ্রেণী প্রভৃতির কথা বলা যায়। আবার গুণগত মান বোঝানোর জন্যও শ্রেণী শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। উদাহরণ হিসাবে উন্নত শ্রেণীর, সাধারণ শ্রেণীর প্রভৃতি কথা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সমাজতত্ত্বে 'সামাজিক শ্রেণী' কথাটি এক ধরনের সামাজিক স্তরবিন্যাস প্রতিপন্ন করার জন্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

শ্রেণীবিন্যাস ও স্তরবিন্যাস ‖ সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি বিশেষ দিক হিসাবে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের কথা বলা হয়। সামাজিক স্তরবিন্যাসের আলোচনায় 'শ্রেণী' সংক্রান্ত ধারণা সমাজতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসাবে বিবেচিত হয়। সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস সর্বাংশে সমার্থক নয়। শ্রেণীবিন্যাস সব সময় স্তরবিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয় না। সমাজব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে, যখন একটা 'উলম্ব' (vertical) বা উচ্চ-নীচ সম্পর্ক বর্তমান থাকে, তখনই শ্রেণীবিন্যাস স্তরবিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয়।

শ্রেণীর সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই ‖ 'শ্রেণী' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মানবসমাজে কালের প্রবাহে শ্রেণী সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। তা ছাড়া সমাজব্যবস্থার কাঠামোরও রদবদল ঘটে। তার ফলে শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণারও পরিবর্তন ঘটে। আর্থিক সংগতি, সামাজিক মর্যাদা, মনস্তত্ত্ব, শক্তি-সামর্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রেণীর ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়। বিভিন্ন যুগে শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে এবং 'শ্রেণী' এই শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্নভাবে।

শ্রেণী সম্পর্কে ম্যাকাইভার ও পেজের অভিমত ‖ এই দুই সমাজতত্ত্ববিদ 'শ্রেণী' বলতে সমাজের এমন একটি অংশকে বুঝিয়েছেন, যে অংশ সমাজের অবশিষ্ট অংশ থেকে স্বতন্ত্র। ম্যাকাইভার ও পেজের অভিমত অনুসারে জনসমষ্টির যে অংশ 'সামাজিক মর্যাদা'র ভিত্তিতে অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক তাকে বলা হয় সামাজিক শ্রেণী। সুতরাং সামাজিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয় সামাজিক দূরত্ববোধ থেকে। সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা থাকে। তার ফলে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সৃষ্টি হয় পার্থক্য বা সামাজিক প্রতিবন্ধকতার। এই প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করে সামাজিক দূরত্বের এবং অবশেষে সামাজিক দূরত্বই জন্ম দেয় সামাজিক শ্রেণীর। সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শ্রেণীবিভাগ তাৎপর্যপূর্ণ। এর তাৎপর্য হল এই যে, সমাজের একটি অংশ অন্যান্য অংশের থেকে নিজেদের উন্নত বলে মনে করে এবং এই চেতনার তাগিদে তারা অন্যান্যদের থেকে নিজেদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সচেষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্যবোধই হল শ্রেণীর

আত্মসচেতনতার মূল কারণ ও লক্ষণ। বস্তুত এ সমস্ত ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ (social intercourse) নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায়। তখনই সমাজে শ্রেণীবিভাগের সৃষ্টি হয়, যখন সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এবং এই বিভক্তির কারণ হল সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা। ম্যাকাইভার ও পেজের অভিমত অনুসারে বৃত্তি বা আর্থিক আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দল সমাজে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা লাভ করে থাকে। সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে এই ধরনের তারতম্য বা উর্ধ্বাধ (hierarchical) বিন্যাসের কারণে এক দল অন্যান্য দলের থেকে পৃথক প্রতিপন্ন হয়। এবং এইভাবে সৃষ্টি হয় সামাজিক শ্রেণীর।

বটোমোরের অভিমত ‖ বটোমোর-এর মতানুসারে বাস্তবে সামাজিক শ্রেণীও হল একটি গোষ্ঠী। তবে এই গোষ্ঠী আইন বা ধর্মের দ্বারা স্বীকৃত বা নির্দিষ্ট নয়। তাঁর অভিমত অনুসারে ধনতান্ত্রিক শিল্পসমাজ গড়ে উঠেছে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। এবং এই শিল্পসমাজেরই বৈশিষ্ট্যসূচক গোষ্ঠী হল সামাজিক শ্রেণী। সামাজিক শ্রেণীর মূল ভিত্তি হল আর্থনীতিক কারণ। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও সামাজিক শ্রেণী হল আর্থনীতিক গোষ্ঠী বা দলের থেকে বৃহত্তর ব্যাপার বা অতিরিক্ত কিছু। সামাজিক শ্রেণী বলতে কেবলমাত্র আর্থনীতিক গোষ্ঠীকেই বোঝায় না, তা হল আরও অতিরিক্ত কিছু। সামাজিক শ্রেণী কোন বদ্ধ গোষ্ঠী নয়, এ হল তুলনামূলকভাবে মুক্ত।

অধ্যাপক জিসবার্ট ‖ জিসবার্ট সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে উর্ধ্বাধঃ অবস্থান বা তারতম্যের কথা বলেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের স্থায়িত্বের কথাও বলেছেন। তিনি এই দু'ধরনের বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীর ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন।

অগবার্ন ও নিমকফ ‖ ম্যাকাইভার ও পেজে এর মত এই দুই সমাজতত্ত্ববিদ্‌ও বিশ্বাস করেন যে মানবসমাজে বৃত্তিমূলক শ্রেণীবিভাগের ফলে এই সব ঘটে থাকে। কারণ সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আয়, মানসিকতা, শিক্ষা, বিশ্বাস, জীবনযাত্রার প্রণালী প্রভৃতির সঙ্গে পেশাগত সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অগবার্ন ও নিমকফের অভিমত অনুসারে, "সামাজিক শ্রেণীর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর পরিপ্রেক্ষিতে তার অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনতাব্যঞ্জক সামাজিক অবস্থান"।

ম্যাক্স ওয়েবার ‖ সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে ওয়েবার জীবনের সুযোগ-সুবিধা ও সম্ভাবনা (life chances)-র উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি হিসাবে তিনি জীবনযাত্রার সুযোগ-সুবিধা ও সম্ভাবনার কথা বলেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শ্রেণবিন্যাসের বিষয়টিকে বিচার-বিবেচনা করেছেন। সুতরাং এদিক থেকে বিচার করলে ব্যক্তির শ্রেণী নির্ধারিত হয় তার আর্থিক অবস্থা বা সম্পত্তির অধিকার অনুসারে।

শ্রেণীর দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ‖ উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, সামাজিক শ্রেণীর দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান। (ক) শ্রেণী বলতে একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠীকে বোঝায়। এই গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীর থেকে স্বতন্ত্র। এবং তদনুসারে এই গোষ্ঠী সমাজের স্বীকৃতিযুক্ত। (খ) উর্ধ্বাধ সম্পর্ক (hierarchical relation) বা স্তরবিন্যাসের মাধ্যমে শ্রেণী সচেতনতা (class consciousness) সংহত হয়।

বহিরাবরণগত বৈশিষ্ট্য ‖ অভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সমতার নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। সামাজিক শ্রেণীমাত্রেরই কতকগুলি মূল বিষয়ে সমতা থাকে। এই সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু এই পার্থক্য শ্রেণীবিন্যাসের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। প্রত্যেকটি সামাজিক শ্রেণীরই বহিরাবরণগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ, আদব-কায়দা, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বিশেষত সামাজিক সম্পর্কসমূহের মাধ্যমে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশিত হয়। ঐগুলি হল শ্রেণীর বহিরাবরণগত বৈশিষ্ট্য। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের

পরিপ্রেক্ষিতে অপর শ্রেণীর সঙ্গে একটি শ্রেণীর পার্থক্য সূচিত হয় এবং এই পার্থক্য অব্যাহত থাকে। অভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ শ্রেণীসুলভ আচরণ করতেই অভ্যস্ত থাকে। শ্রেণীর বহিরাবরণগত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই শ্রেণীবিন্যাস সহজেই নির্ধারণ করা যায়।

আর্থিক অবস্থা ও বৃত্তির বিন্যাস ‖ আবার আর্থনীতিক অবস্থার প্রশ্নটিও সামাজিক শ্রেণীর বহিরাবরণগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। কারণ যে-কোন ব্যক্তির শিক্ষা-দীক্ষা, বৃত্তি-নির্ধারণ, জীবনযাত্রার প্রণালী প্রভৃতি আর্থিক অবস্থার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। অর্থাৎ সামাজিক শ্রেণীর একটি সূচক হিসাবে ব্যক্তির আয় বা আর্থিক সঙ্গতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু অন্যতম সূচক হলেও আর্থিক সঙ্গতি সামাজিক শ্রেণীর একমাত্র সূচক হিসাবে গণ্য হতে পারে না। সমাজে শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে বৃত্তির বিন্যাসও হল একটি বিশিষ্ট সূচক। এবং সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের এই সূচকটিও অত্যন্ত সুপরিচিত। তবে এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে এ ক্ষেত্রে দেশকালভেদে বিভিন্ন বিষয়ের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

শ্রেণী-চেতনা ‖ সামাজিক শ্রেণীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল শ্রেণী-সচেতনতা (class consciousness)। কোন শ্রেণীর সকল মানুষই যে অভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, এই বোধকে বলে শ্রেণী-চেতনা। দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা, মনোভাব-মূল্যবোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভিন্নতা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সকলের মধ্যে একাত্মবোধের সৃষ্টি করে। এইভাবে সমশ্রেণীর অন্তর্গত সকল মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এক শ্রেণী-চেতনা। এই শ্রেণী-চেতনা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি বিষয় হল: (১) অভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সকলের মধ্যে একাত্মবোধ বর্তমান থাকে এবং (২) সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি হয় অন্যান্য শ্রেণীর থেকে স্বাতন্ত্র্যবোধ।

সমাজের শ্রেণী-ব্যবস্থাকে সামাজিক সচলতার (social mobility) পরিপ্রেক্ষিতে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) সচল শ্রেণী-ব্যবস্থা এবং (২) নিশ্চল শ্রেণী-ব্যবস্থা।

(১) সচল শ্রেণী-ব্যবস্থা (Open class-system) ‖ গুণগত যোগ্যতার বিচারে স্তরবিন্যাস স্থিরীকৃত হওয়ার ব্যবস্থাকে বলে সচল শ্রেণী-ব্যবস্থা। অর্থাৎ যে শ্রেণী-ব্যবস্থায় যোগ্যতার মান অনুসারে এক শ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীতে গমনাগমনের পথ উন্মুক্ত থাকে তা হল সচল শ্রেণী-ব্যবস্থা। এ-রকম সচল শ্রেণী-ব্যবস্থা পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়।

(২) নিশ্চল শ্রেণী-ব্যবস্থা (Closed class-system) ‖ যে শ্রেণী-ব্যবস্থায় এক শ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীতে গমনাগমনের সুযোগ একেবারে থাকে না, তাকে বলে নিশ্চল শ্রেণী-ব্যবস্থা। নিশ্চল শ্রেণী-ব্যবস্থায় সামাজিক সচলতার পথ পুরোপুরি রুদ্ধ থাকে। এ ধরনের নিশ্চল শ্রেণী-ব্যবস্থার উদাহরণ হিসাবে ভারতবর্ষের জাতিভেদ ব্যবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী-চেতনার তীব্রতা একই রকম থাকে না। শ্রেণী-চেতনার তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক শ্রেণীসমূহের মধ্যে এই শ্রেণী-চেতনার তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি কতকগুলি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ক) সামাজিক সচলতার প্রভাব ‖ শ্রেণী-চেতনার হ্রাস-বৃদ্ধি সামাজিক সচলতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার সুযোগ যদি থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ইচ্ছাও থাকে, অথচ বাধা অতিক্রম করা সহজে সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে শ্রেণী-চেতনার তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অর্থাৎ সামাজিক সচলতা সম্ভব কিন্তু মোটেই সহজসাধ্য নয়; একটি শ্রেণী থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নত অন্য একটি শ্রেণীতে উপনীত হওয়া সম্ভব, কিন্তু এই উপনীত হওয়ার বিষয়টি সহজে সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়, এ রকম ক্ষেত্রে শ্রেণী-চেতনা স্বাভাবিকভাবেই তীব্রতর হয়ে থাকে। বিপরীতক্রমে যেখানে উচ্চতর শ্রেণীতে

উন্নীত হওয়া সহজেই সম্ভব, অর্থাৎ সামাজিক সচলতা যে সমাজে সহজসাধ্য, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই শ্রেণী-চেতনা কম হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে আর একটি তৃতীয় বিকল্প অবস্থার কথা বলা যায়। যে সমাজব্যবস্থায় এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে গমনাগমনের পথ পুরোপুরি রুদ্ধ, অর্থাৎ সামাজিক সচলতার পথ একেবারে বন্ধ, সেখানে শ্রেণীবিন্যাসের বিষয়টি বস্তুত স্বভাবগত বিষয়ে বা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। স্বভাবতই এই রকম ক্ষেত্রে সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা প্রবল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথার কথা এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

(খ) শ্রেণী-সংহতির প্রভাব || সুদৃঢ় শ্রেণী-সংহতির ভিত্তিতে শ্রেণী-চেতনা বৃদ্ধি পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা বর্তমান থাকে। কোন একটি শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শ্রেণী-সংহতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক কতকগুলি উপাদানের কথা বলা যায়। এই উপাদানগুলি হল অভিন্ন অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, জীবনধারা প্রভৃতি। এই সমস্ত বিষয়ে অভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি শ্রেণীর সকলের মধ্যে সংহতির সৃষ্টি হয়।

(গ) পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীস্বার্থ || দুটি শ্রেণীর মধ্যে যদি পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ বর্তমান থাকে, তা হলে সে ক্ষেত্রে শ্রেণীচেতনা সাধারণত অধিক হয়। এ রকম ক্ষেত্রে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তির নিজেদের মধ্যে একাত্মতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়, আবার অপরদিকে বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীর প্রতি শত্রুতার মনোভাব বা বিরুদ্ধভাব বৃদ্ধি পায়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা যায়।

শ্রেণী সম্পর্কিত মার্কসীয় ধারণা || মার্কসীয় সমাজ-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'শ্রেণী'ই হল মুখ্য উপাদান এবং ইতিহাসের চালিকা-শক্তি হল শ্রেণী-সংগ্রাম। কার্ল মার্কস সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'শ্রেণী' ও 'শ্রেণী-সংগ্রাম' সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী হল এক আর্থ-সামাজিক সত্তা। উৎপাদন-উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির শ্রেণী নির্ধারিত হয়। ব্যক্তির শ্রেণীগত অবস্থান নির্ভর করে সামাজিক উৎপাদন-উপাদানের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক এবং সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তির অবস্থানের উপর। মার্কসবাদে সামাজিক শ্রেণীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে উৎপাদনের উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে। মার্কসবাদে ব্যক্তির মানসিকতা এবং আয় ও অভ্যাসের তারতম্যকে শ্রেণীগত পার্থক্যের উৎস বা সামাজিক শ্রেণী নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হয় না।

মার্কস-এঙ্গেলস ব্যাপকভাবে 'শ্রেণী' কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কোথাও এর সংজ্ঞা দেননি। মার্কস দুটো যুযুধান মূল শ্রেণীর কথা বলেছেন। এ দু'টি শ্রেণী হল বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত। সমস্ত উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বণ্টন বুর্জোয়াদের নিয়ন্ত্রণাধীন। জীবনধারণের জন্য বুর্জোয়াদের কাছে শ্রম বিক্রী করতে প্রলেতারিয়েতরা বাধ্য হয়। প্রধান দুটি শ্রেণী ছাড়া মার্কস সমাজে অন্যান্য শ্রেণীর অস্তিত্বের কথাও বলেছেন। যেমন, সমাজে পাতি বুর্জোয়া (Petty bourgeoise) ও কৃষক শ্রেণী থাকে। তবে বিপ্লবের ক্ষেত্রে এদের কোন ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেননি। তা ছাড়া ক্ষেতমজুর, বুদ্ধিজীবী ও লুম্পেন প্রলেতারিয়েত (Lumpen Proletariat)-এর কথাও তিনি বলেছেন। মার্কস চোর, অপরাধী, ভবঘুরে প্রভৃতি ইতর শ্রেণীর লোকদের লুম্পেন প্রলেতারিয়েত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এরা রীতিমত প্রতিক্রিয়াশীল এবং সমাজের প্রগতিতে এদের কোন ভূমিকা নেই।

মার্কসের মতানুসারে সমাজ গতিশীল। এই গতিশীল সমাজে কোন শ্রেণী চিরদিন একই রকম থাকতে পারে না। শ্রেণী সম্পর্কিত মার্কসীয় ধারণার মধ্যে একটি মনোগত বা পরিবর্তনশীল উপাদান পরিলক্ষিত হয়।

'অনাত্মসচেতন' ও 'আত্মসচেতন' শ্রেণী || শ্রেণী-সম্পর্কিত আলোচনায় মার্কস 'Class in itself' এবং 'Class for itself' এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কোন জনগোষ্ঠী নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে এবং সুসংগঠিত হতে না পারলে শ্রেণীতে পরিণত হয় না। শ্রেণীতে পরিণত না হলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম রাজনীতিক রূপ ধারণ করে না। প্রথমে মার্কস প্রতিপন্ন করেছেন যে শুরুতে সর্বহারা শ্রেণী ছিল অভিন্ন আর্থনীতিক অবস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সমাহার অর্থাৎ শুরুতে এই শ্রেণী ছিল 'অনাত্মসচেতন শ্রেণী' (Class in itself)। তারপর সর্বহারা শ্রেণী তাদের শ্রেণীগত স্বার্থ ও রাজনীতিক লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং এইভাবে সর্বহারা একটি 'আত্মসচেতন শ্রেণী'তে (Class for itself) পরিণত হয়।

শ্রেণীর সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে লেনিন উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তির ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতানুসারে শ্রেণী বলতে এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বতন্ত্র স্থান অনুসারে এই পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব স্থান আছে। শ্রেণীর ধারণা উৎপাদন-প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তা ছাড়া প্রতিটি উৎপাদন পদ্ধতি একটি করে শ্রেণী সৃষ্টি করে। শ্রেণী সম্পর্কিত লেনিনের সংজ্ঞার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। (ক) শ্রেণী হল ইতিহাস-সৃষ্ট। মানবসমাজের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রতিটি উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে শ্রেণী অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। (খ) শ্রেণী সামাজিক উৎপাদনে যে ভূমিকার অধিকারী হয় তদনুসারে শ্রেণী বিশিষ্ট হয়ে উঠে। (গ) শ্রেণী উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটলে, শ্রেণীর কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে। (ঘ) শ্রেণী উৎপাদনের উপাদানগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু এই সম্পর্ক সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। শ্রেণী সম্পর্কিত লেনিনের বক্তব্য প্রধানত পরস্পর-বিরোধী শ্রেণী-বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হয়। তবে এই সংজ্ঞার সাহায্যে গুণগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী-সম্পর্কের পরিবর্তন এবং শ্রেণী-বিলোপের বিষয়টিও ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

সর্বকালের এবং সর্বপ্রকারের সমাজব্যবস্থায় জীবনধারণের তাগিদে মানুষকে উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হয়। উৎপাদনের উপকরণ এবং শ্রমের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় উৎপাদন শক্তির। তবে মানুষের পরিশ্রমই হল প্রধান শক্তি। কিন্তু মানুষ একা নয়, সামাজিকভাবে বা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষ কোন কিছু উৎপাদন করে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এই যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে বলে উৎপাদন-সম্পর্ক। উৎপাদনের উপাদানগুলিকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয় এই সম্পর্কের। কেউ এই উপাদানসমূহের মালিক, আবার কেউ কায়িক শ্রমের দ্বারাই উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে। যে সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ সামাজিক মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে সেখানেই থাকে শ্রেণীভেদ। উৎপাদন-সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থান অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস নির্দিষ্ট হয়। এমিল বার্নস (Emile Burns)-এর অভিমত হল: "একই প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে সমাজের এইরকম এক-একটি অংশ হল এক-একটি শ্রেণী।" লেনিন বলেছেন: "শ্রেণীগুলি হল এমন কতকগুলি বৃহৎ জনসমষ্টি যাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা নির্ভর করে ঐতিহাসিক ধারায় নির্ধারিত একটি সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের নাম অনুযায়ী, উৎপাদনের উপায়সমূহের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অনুযায়ী, শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা অনুযায়ী, এবং এর ফলস্বরূপ সমাজের যে সম্পদ তারা সৃষ্টি করে তার অংশের মাত্রা এবং সেই অংশ অর্জনের পদ্ধতির দ্বারা।"

শ্রেণীর ব্যক্তিগত ও বিষয়ীগত ধারণা || মার্কসবাদীরা 'শ্রেণী'র ধারণাটির দুটি দিকের কথা বলেন। এই দুটি দিক হল: বিষয়গত (objective) এবং বিষয়ীগত (subjective)।

৯.৩.৩ জাতিভেদ প্রথা (Caste System)

জাতি-ব্যবস্থা স্তরবিন্যাসের অনন্য উদাহরণ || সামাজিক স্তরবিন্যাসের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসাবে ভারতের জাত-পাত ব্যবস্থার কথা বলা যায়। বটোমোর-এর অভিমত অনুসারে স্তরবিন্যাসমূলক অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে জাতপাত ব্যবস্থার কোন রকম সাদৃশ্য নেই বা অন্য কোন রকম স্তরবিন্যাসের মধ্যে জাতপাতের উপাদান একেবারেই নেই এমন কথা বলা যায় না। আর্থনীতিক স্তরভেদের সঙ্গে জাতপাত ব্যবস্থার সংযোগ পরিলক্ষিত হয়।

জাতির সংজ্ঞা || জাতি হল জন্মভিত্তিক। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে জাতির ভিত্তি হল জন্ম। 'জাতি' শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে 'জন' ধাতু থেকে। 'জন' বলতে জন্ম বোঝায়। সুতরাং জাতি হল জন্মভিত্তিক। এবং জন্মভিত্তিক বলেই জাতি হল অপরিবর্তনীয়। সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচনা করলে জাতি হল বৃত্তিগতভাবে বিশেষীকৃত একটি গোষ্ঠী। তা ছাড়া জাতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল অন্তর্বিবাহ। মজুমদার ও মদন (D. N. Mazumdar and T. N. Madan) এই দুই সমাজবিজ্ঞানীর মতানুসারে জাতি হল একটি বদ্ধ গোষ্ঠী। বস্তুত জাতি বলতে এক আন্তর্বৈবাহিক গোষ্ঠীকে বোঝায়। এ হল এক বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী।

জাতি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য || জাতির ধারণা পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতির কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

(১) বংশানুক্রমিতা || বংশানুক্রমিতা (hereditary) জাতি প্রথার প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(২) আন্তর্বৈবাহিক গোষ্ঠী || জাতি হল এক আন্তর্বৈবাহিক গোষ্ঠী। স্বজাতির গণ্ডীর মধ্যেই বৈবাহিক সম্পর্ক সীমাবদ্ধ থাকে।

(৩) সমপাঙ্‌ক্তেয়তা || জাতি প্রথার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সমপাঙ্‌ক্তেয়তা (commensality)। জাতিভেদ ব্যবস্থার এই সমপাঙ্‌ক্তেয়তার ধারণাটি ব্যাখ্যা করা দরকার। বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু বিধিব্যবস্থা বা নিষেধাজ্ঞা (taboos) প্রচলিত থাকে। সাধারণত খাদ্যাখাদ্য এবং জল-চল ও জল-অচল প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই সমস্ত বিধিব্যবস্থা বা নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। এগুলিকেই বলে সমপাঙ্‌ক্তেয়তা।

(৪) জাতিগত বিধি-বিধান ও প্রথা || প্রতিটি জাতিরই নিজস্ব কিছু বিধি-বিধান ও প্রথা প্রচলিত থাকে। জাতিমাত্রেই তার স্বতন্ত্র মর্যাদা যথাযথভাবে সংরক্ষণের স্বার্থে এই সমস্ত বিধিব্যবস্থা ও প্রচলিত প্রথাকে কার্যকর করার ব্যাপারে সতর্ক ও সচেষ্ট থাকে।

(৫) সামাজিক সচলতার অভাব || জাতি প্রথার ক্ষেত্রে সামাজিক সচলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। গুণগত যোগ্যতার বিচারে জাতি পরিবর্তন করা যায় না।

শ্রীনিবাসের ভিন্ন মত || এ ক্ষেত্রে ভারতের বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী শ্রীনিবাস (M. N. Srinivas) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর অভিমত অনুসারে 'সংস্কৃতায়ন' (sanskritisation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন নীচু জাতি অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতিতে উন্নীত হতে পারে। অপেক্ষাকৃত নীচু জাতি উন্নততর জাতির বৃত্তি, আচার-বিচার প্রভৃতি অনুকরণের মাধ্যমে জাতি বিন্যাসের ক্ষেত্রে উন্নততর স্তরে উন্নীত হতে উদ্যোগী হয়। এই উদ্যোগকে সমাজবিজ্ঞানী শ্রীনিবাস 'সংস্কৃতায়ন' নামে আখ্যায়িত করেছেন।

(৬) জীবন-ধারাগত পার্থক্য || বিভিন্ন জাতির মধ্যে জীবনধারাগত পার্থক্য জাতিভেদ প্রথার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বংশানুক্রমিকতা, সমপাঙ্‌ক্তেয়তা, শুদ্ধাশুদ্ধি, আন্তর্বিবাহ, বৃত্তিগত বিভাগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের স্বাতন্ত্র্য বর্তমান থাকে। এই স্বাতন্ত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি জাতির জীবনধারার ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

(৭) বৃত্তিবিভাগ || জাতিভেদ প্রথার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে বৃত্তি বিভাগের কথা বলা হয়। অধিকাংশ জাতিই হল বৃত্তিভিত্তিক। তা ছাড়া বৃত্তিভিত্তিক জাতির বৃত্তিও হল বংশানুক্রমিক। আগেকার দিনে মোটামুটিভাবে প্রতিটি জাতির পেশা ছিল পূর্বনির্ধারিত। তবে আধুনিক কালে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।

(৮) জাতিসূচক পদবী || অনেক সময় পদবির পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিভেদের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের; সেন, সেনগুপ্ত, দাসগুপ্ত প্রভৃতি বদ্যিদের জাতিসূচক পদবির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিশেষভাবে বিকশিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে। ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। স্বভাবতই আধুনিক ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার কাঠামো ও প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে, এ কথা অনস্বীকার্য।